অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 44-51
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.006

HARISHANKAR JALADASER UPONASYE NARI : PRANTIKATA,PROTIRODH O ATMAPRATISTHA / হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে নারী : প্রান্তিকতা, প্রতিরোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

BISHAL PAUL / বিশাল পাল
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email: imbishal093@gmail.com

Accepted: 03.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
Harishankar, Upanyas, Jibonchitro, Nimnabargio

Abstract:
Harishankar Jaladas is one of the most prominent contemporary Bengali novelists known for his realistic portrayal of marginalized communities. His novels depict the lives and struggle of fishermen, sweepers, cobblers, sex workers, and other socially disadvantaged groups. In particular, his female characters represent the suffering, resilience, self-sacrifice, dignity, and humanity of women living on the margins of society. This study explores the multidimensional representation of women through the characters of Bhuvaneshwari in Jalputra, Chandrakala in Dahankal, and Mohana in Mohana.

Bhuvaneshwari represents the resilience of a widowed fisherwoman who struggles to support her family with determination, patience, and self-respect. Chandrakala embodies the indomitable spirit of a working-class woman whose perseverance, sense of responsibility, commitment to her family, and belief in education reflect the strength of marginalized women. Mohana, on the other hand, portrays the harsh realities of the life of a courtesan, highlighting the conflict between social identity and personal dignity while expressing her longing for love, recognition, and freedom. Through these characters, Jaladas demonstrates that although marginalized women are often excluded from mainstream society, their labour, sacrifice, and moral strength are essential to both family and society.

In conclusion, Harishankar Jaladas portrays women not merely as passive members of the family or society but as resilient, self-reliant, compassionate, and transformative individuals. His female characters challenge conventional stereotypes and offer a powerful representation of the experiences, struggles, and aspirations of marginalized women. Thus, his novels make a significant contribution to Bengali literature and provide valuable insights into feminist and subaltern literary discourse.

Discussion:

মানবসভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা অপরিসীম ও বহুমাত্রিক। সমাজের সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিবার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তবুও ইতিহাসের দীর্ঘ পর্বজুড়ে নারীরা নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং রক্ষণশীল মানসিকতা বহু ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীন বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ফলে নারীর সক্ষমতা ও সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যা আমরা লক্ষ করতে পারি তপোধীর ভট্টাচার্যের বক্তব্যে-

“বহুবিভাজিত সমাজে বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গগত পার্থক্য যেহেতু পীড়নের হাতিয়ার, নারীর অবস্থান সব দিক দিয়ে প্রান্তিকায়িত। এমনকি, প্রকাশ মাধ্যম ভাষা ও পিতৃতন্ত্রের পরাক্রমের কাছে স্বেচ্ছাসমর্পিত।...ইহকালে ও পরকালে পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান থেকে অক্ষয়ের স্বর্গ লাভের ব্যবস্থাপিকা হওয়া ছাড়া নারীর অন্য কোন ভূমিকা নেই পিতৃতন্ত্র।” [১]

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থান ও পরিচয়ে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে। নারীশিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতার বৃদ্ধির ফলে নারীরা আজ সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, প্রশাসন, ব্যবসা, ক্রীড়া এবং গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য প্রমাণ করে যে সুযোগ ও সমান অধিকার নিশ্চিত হলে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। সাহিত্যেও নারীর জীবন ও অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিকেরা নারীর সামাজিক অবস্থান, আত্মপরিচয়, মানসিক জগৎ, সংগ্রাম, স্বপ্ন, বঞ্চনা এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক সাহিত্যচর্চায় নারীকে কেবল পারিবারিক বা গৃহস্থালির পরিসরে সীমাবদ্ধ না রেখে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, চিন্তাশীল সত্তা এবং সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় শক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ কারণে নারী বিষয়ক সাহিত্য বিশ্লেষণ কেবল চরিত্রচিত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ক্ষমতার সম্পর্ক এবং লিঙ্গসমতার প্রশ্নকেও গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ সৃষ্টি করে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারী বিষয়ক আলোচনা কেবল নারীর অধিকার বা অবস্থান বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানবিক সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারী বিষয়ক গবেষণা ও সাহিত্য বিশ্লেষণ সমকালীন সমাজচিন্তা ও জ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের পর বাংলা সাহিত্য জগতে হরিশংকর জলদাস এক অনন্য সাহিত্যিক। তাঁর রচনা জেলে সম্প্রদায়, মেথর, মুচি, বারাঙ্গনা এসব নিয়ে রচিত। নদীকেন্দ্রিক মানুষদের পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছেন সমুদ্র সংগ্রামী মানুষদের জীবনচিত্র। তাঁর লেখায় কল্পনা আশ্রয় পায়নি, বাস্তব জনজীবনই তাঁর সাহিত্যের একমাত্র

.

নিদর্শন। 'জলপুত্র' (২০০৮)উপন্যাসের মধ্যে ওঠে এসেছে সমুদ্র সংগ্রামী জেলেদের জীবনালেখ্য।
এ উপন্যাসে যে বিষয়টি মুখ্যত, সেটি হলো একজন নারী কীভাবে সংগ্রাম করে সমাজে দাঁড়ায় তার এক জীবন্ত রূপকল্প পাই রচনার মধ্য দিয়ে। সে নারী হলো ভুবনেশ্বরী। কোনো এক প্রচন্ড ঝড়ের রাতে তার স্বামী সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। সেখানেই সে অর্থাৎ চন্দ্রমণি নিখোঁজ হয়ে যায়, আর সে ফিরেনি। ফলে যে ছিল একমাত্র খাদ্য উপার্জনকারী, তার অনুপস্থিতিতে সংসারে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে নারী কোনোদিনই বাহিরে বের হয়নি, সে নারী বাধ্য হয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাথার উপর মাছের খাড়াং নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেননা সে যদি এ কাজ না করে তাহলে তার পরিবার অনাহারে মারা যাবে। আসলে নিম্নবর্গের মানুষদেরকে প্রত্যহ জীবনের সঙ্গে সন্ধি করতে হয় বাঁচার জন্য।

'উথালপাথাল বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে উনিশ বছরের ভুবনেশ্বরী।'- এর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠেছে দরিদ্র নারীর এক মায়াবী রূপকল্প। সে তার স্বামী চন্দ্রমণির জন্য অপেক্ষারত। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ভুবনেশ্বরী। একজন জেলে সম্প্রদায়ের বিধবা নারী কীভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজ বেঁচে থাকে তার বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে।

লেখক হরিশংকর জলদাস উপন্যাসের কাহিনি নাটকীয় ভাবে শুরু করেন। গঙ্গাপদের মা, জেলে পাড়ার জেলে চন্দ্রমণির স্ত্রী ভুবনেশ্বরী উৎকণ্ঠা ও প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে। চন্দ্রমণি যখন ফিরল না, তখন বুড়ো শ্বশুর এবং তার একমাত্র সন্তানকে নিয়ে জীবিকার জীবন সংগ্রাম শুরু করেছিল ভুবেনেশ্বরী। তার মধ্যে লক্ষ করা যায় ধৈর্য। কারণ তার ননদী উর্বশীর ছেলেমেয়েদের দুষ্টামি সে হজম করতে অভ্যস্ত। তাছাড়াও ধৈর্যের সহিত শ্বশুরের সেবায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেনি। সন্তানের লেখাপড়ার জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে পিছপা হয়নি। সে তার জীবনে সুখটুকু পায়নি, যার মধ্য দিয়ে জেলে সমাজের দরিদ্র বিধবা নারীর রূপকল্প ফুটে ওঠে তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ধৈর্যের পাশাপাশি অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণও করতে পারে সে। কারণ উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই শান্তশিষ্ট ভুবন অন্যায় দেখে জুনাইপ্যার বাপকেও শায়েস্তা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ঔপন্যাসিক ভুবেনেশ্বরী চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'বেশিরভাগ নারী যে ধরনের বৈষয়িক স্বামী চায়, চন্দ্রমণি সেরকম ছিল না। একটা সময়ে চন্দ্রমণি তার মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিলো। একে অন্যের শরীরের সান্নিধ্যে লাভের পর উভয়ের মানসিক দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিল। নিত্যদিনের অভ্যাসে জড়িয়ে থেকে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা যত্ন করে, রান্নাবান্না, স্বামীর দেখাশোনা, পরিবারের সকলের অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু, ছেলের পড়াশোনা- এসব নিয়ে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দিলো ভুবন। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, কলুষতা-এসব নিয়ে পুঁতিগন্ধময় যে জেলেসমাজ তার মধ্যেই জীবনটাকে এতদূর টেনে এনেছে সে।'
সমাজ ও সমাজের মানুষ সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার চরিত্র গুণের জন্য। তার জীবনের বড় দুঃখ ছিল ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত করতে ব্যর্থ হওয়া। দারিদ্রতাকে সেদিকে এগোতে দেয়নি, জনম দুঃখিনী মায়ের একটি দীর্ঘশ্বাস জেলেপাড়ার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে থাকে। ভুবন চরিত্রের প্রতি লেখকের দরদ পাঠককে বারবার একটি আদর্শ নারীর কথা মনে করিয়ে দেয়। ভক্তি ও শ্রদ্ধা তারমধ্যে আমরা লক্ষ করতে পারি অহরহ। উদাহরণ স্বরূপ-

> "ভুবন বলল,' তোঁয়ার আশিব্বাদে কেলাস ফোরত উইঠ্যে। তুঁই ইক্কিনি আঁর পোয়ারে পরানখুলি আশিব্বাদ গইজ্যে। যেএন লেয়াপড়া গরিত পারে। আঁর কষ্টগান ভুলাই দিত পারে।" [২]

.

এখানে গৌরাঙ্গ সাধুর প্রতি ভুবনেশ্বরীর অগাধ শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়েছে। গৌরাঙ্গ সাধুর উত্তর পেয়ে পরম তৃপ্তিতে সে বাড়ি ফেরে। একজন নারী শিক্ষার প্রতি অর্থাৎ ছেলেকে শিক্ষিত বানানোর কথা ভেবে পরম আনন্দ উপভোগ করে, তা লক্ষ করা যায় তার মধ্য দিয়ে।

ভুবনেশ্বরী চরিত্রে স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা লক্ষ করা যায় উপন্যাসের শুরুতে। স্বামী চন্দ্রমণির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে তার চরিত্রগুণে। চন্দ্রমণি নিখোঁজ হওয়ার পর তার মনে নানাভাবে টান উপলব্ধি করা যায়। একদিন মাইগন্যা অর্থাৎ ভুবনেশ্বরীর ননদের ছেলে যখন তাকে বলে যে, সে বাড়ি যাওয়ার সময় চন্দ্রমণির হালিশটা নিয়ে যাবে। ঠিক তখনই ভুবন স্বভাববিরোধী প্রচন্ড চিৎকার করে বলে উঠলো-

> "খবদ্দার, এই হালিশ তুই নো ছুবি। লই যাওনতো দূরের কথা।" [৩]

তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে ভুবনের এক নতুন সত্তা, যা হল স্বামীর একমাত্র চিহ্ন। এটা কখন হারাতে রাজি নয়। যদিও তার জীবনে দারিদ্রতা নিত্যসঙ্গী, তথাপিও তার মধ্যে লুকিয়ে আছে দানবের লক্ষণ। তার ননদ যখন তাদের বাড়িতে আসে, তখন তাদেরকে বুঝতে দেয় না যে, তার জীবন অনেক কষ্টে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। বরং তাদেরকে আদর আপ্যায়নে রেখেছে। ঊর্বশী যখন বলে ওঠে-

> "তোঁয়ার সুটকেশত দেইলাম যে বউত শাড়ি পড়ি রইয়্যে, তোঁয়ার তো এখন বিধবার বেশ। সাদা ধুতি পর। রঙিন কাওর পরন্যা কেউ নাই। তোঁয়ার শাড়িগিনি আঁরে দি ফেলাও না।" [৪]

সে তখন না বলল না। বরং দামি শাড়িগুলো ননদকে দিয়ে দেয়। এখানে লক্ষ করা যায় তার চরিত্রের বিস্ময়তা। কেননা সে দরিদ্র হলেও মন অনেক বড়ো। যা অন্য নারীতে ঠিক ততটা উপলব্ধি করা যায় না। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে ব্যতিক্রমী এক রক্তমাংসে গড়া মানবী চরিত্র হলো ভুবনেশ্বরী। তারমধ্যে ভালোবাসা, উদার মন, নিষ্ঠাবান, দিক প্রতীয়মান হয়েছে। ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস জেলে সমাজের বিধবা নারীর জীবন অংকন করেছেন একেবারে বাস্তব চিত্রপটের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের শুরু ও শেষ ভুবনেশ্বরীর জীবন কাহিনিকে অবলম্বন করে। এককথায় আমরা বলতে পারি ভুবনেশ্বরী চরিত্র উপন্যাসে অদ্বিতীয়।

'দহনকাল' উপন্যাসে নারী চরিত্র গুলোর মধ্যে অন্যতম চরিত্র হল চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা রাধানাথের মাতা। নিম্নবর্গের জেলে সমাজের নারীর জীবন প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে। নারী হিসেবে নয়, পরিচয় তার কোনো না কোনভাবে কোনো না কোনো পুরুষের সঙ্গে অন্বিত। স্বতন্ত্র কোন পরিচয় রক্ষিত হয়নি। ঔপন্যাসিক শ্রমজীবী নারী যোদ্ধা হিসেবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তার বিবাহিত জীবনের চার বছরের মধ্যে নেমে আসে দুর্যোগ স্বামী রামকানাইয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। উপন্যাসে তা ঔপন্যাসিক প্রথমে ব্যক্ত করেছেন এভাবে-

> "চন্দ্রকলা দাসী, মেছোপাড়ার অন্য দশটি বিধবা জেলেনির মতোই। বিয়ের চার বছরের মাথায় স্বামীটি তার বিহিন্দিজালে আটকে জলের তলায় চলে যায়।.... মৃতদেহের পায়ের কাছে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল চন্দ্রকলা। কাঁদেনি। সামনে দাঁড়ানো তিন বছরের রাধানাথের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছিল। সেই থেকেই চন্দ্রকলার জীবন সংগ্রামের শুরু।...." [৫]

এভাবেই আরও দশটি বিধবা নারীর মতো জীবন সংগ্রাম শুরু করে চন্দ্রকলা। সমুদ্র থেকে মাছ কিনে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করে পরিবার চালাতে শুরু করে। দশ বছর পর্যন্ত রাধানাথ পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্রকলা কখন তার ভেতরের মর্মরিত হাহাকার রাধানাথকে বুঝতে না দিয়ে মনের যন্ত্রনা ও শারীরিক কষ্টকে চেপে রেখে ছেলের সামনে দুবেলা ভাত তুলে ধরেছে। এর মধ্য দিয়ে নারীশক্তি প্রতিফলিত হয় চন্দ্রকলার মধ্য দিয়ে।

.

রাধানাথের চব্বিশ বছর বয়সে চন্দ্রকলা কর্ণফুলীর হরবাঁশির মেয়ে বসুমতির সঙ্গে বিয়ে দেয়। ভোরবেলায় সূর্য যেমন পরম স্নেহে প্রাণের স্পর্শ এঁকে দেয়, ঠিক তেমনি বসুমতির ভালোবাসায় দায়িত্ববোধে চন্দ্রকলার জীবন বিকশিত হতে থাকে। এভাবে চলতে থাকে চন্দ্রকলার জীবন। চন্দ্রকলা মাছের খাড়াং নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় সংসারের খাবার জোগাড়ের জন্য। দেখতে দেখতে নাতি-নাতনি পেয়েও তার সেই মাছ বিক্রি করে সংসার চালানো চলতে থাকে। লেখক চন্দ্রকলাকে এদিক থেকে পুরুষের দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়েছেন। যদিও সে নারী তবুও পুরুষত্ব সম্বন্ধীয় দায়িত্ব তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নাতি নাতনির প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও তার মধ্যে দেখা যায়। বসুমতির প্রতিও ছিল তার মাতৃসুলভ আচরণ। বসুমতি যখন তার বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন চন্দ্রকলা বলে উঠে-

> "কোনো অসুবিধা অইতো নো। আঁই রাইন্ধ্যম। তুঁই বাওরঅ বাড়িত্ গেইওদে বউত্ বছর। বেড়াই আইও গই।" [৬]

মুখে হাসি রেখে কথাগুলো বলে চন্দ্রকলা। আসলে বসুমতিকে সে বধূ হিসেবে নয়, নিজের মেয়ে মনে করে। এখানে দরিদ্র নিম্নবর্গের সেই গোটা নারী সমাজের প্রীতি, ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। তাদের কাছে হয়ত টাকা পয়সা নাও থাকতে পারে, কিন্তু একটা সুন্দর মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এটা বলা যায় যে নিম্নবর্গের মানুষ দের মধ্যে অপরিসীম ভালোবাসা বিরাজমান, যা লেখক চন্দ্রকলার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। হরিদাস যেদিন পঞ্চম শ্রেণি পাস করল সেদিন চন্দ্রকলার মধ্যে একটা গভীর তৃপ্তি লক্ষ্য করা গেল। প্রান্তিকায়িত সমাজের অসম বয়সী দুটো মানুষের খুশিতে গাছতলাটি মেতে উঠল। তখন চন্দ্রকলা ভাবছে তার বংশের কেউ এই প্রথম উঁচু ক্লাসে উঠলো, তার বংশের ধারায় একটা ভিন্ন স্রোত এসে লাগলো, যায় একটা নতুন জীবন প্রবাহের সূচনা করবে।

চন্দ্রকলার মধ্যে লেখক অন্য আরেকটি দিক তুলে ধরেছেন, সেটা হল প্রতিবাদিনী নারী। আমরা উপন্যাসের দেখতে পাই স্কুল থেকে ফেরার পথে সুধীর তার নাতি হরিদাসের সঙ্গে রাস্তায় মারধর করে। তার ফলে যখন সে খবর চন্দ্রকলা পায়, তখনই সে হরিদাসকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে; রাধানাথকে সঙ্গে করে মনোরঞ্জন বহদ্দারের বাড়ি যায়। গিয়ে বলে ওঠে-

> "বহাদ্দার অ মনোরঞ্জন বহদ্দার, বাইর হ। চা তোর পোয়ার কীর্তি।" [৭]

এ পাড়ার কেউ কোনোদিন চন্দ্রকলার এরূপ উগ্রমূর্তি দেখেনি। আর সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতে শোনেনি। মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা থাকে, যা অতিক্রম হলে মানুষ প্রতিক্রিয়া করে। যা দেখাতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক হরিশংকর জলদাস চন্দ্রকলার মধ্য দিয়ে।

মোহনা' উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল মোহনা। তাকে ঘিরে উপন্যাসের শুরু ও সমাপ্তি ঘটে। জলপ্রবাহের মোহনার সঙ্গে লেখক একাকার করে তুলেছেন সেই চরিত্রটিকে। মোহনা একাদশ শতাব্দীর এক গণিকা। বরেন্দ্র ভূমির কালিন্দী নদীর উচ্ছলতা তার সমস্ত অবয়বে। বাংলা সাহিত্যে বারাঙ্গনাদের নিয়ে স্বতন্ত্র অনেক কথাসাহিত্য রচিত হয়েছে সেসব উপন্যাসে শুধু তাদের জীবন চিত্র নয়, অনেক উপন্যাসে এসেছে তার বাস্তব বর্ণনা। যা লক্ষ করা যায় এই উপন্যাসে।

মোহনা সম্পর্কে লেখক এর বর্ণনা-

> "উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মোহনা। জালিকাদের ঘরের ফরসা রঙের নারী নেই। ফরসা রঙটা বামুনদের জন্য। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য নারীরাও ফরসা হয়। শূদ্রের শূদ্র নমঃশূদ্র। চাঁড়াল, মুচি, দুলিয়া, কেওড়া, ধীবর এরা নমঃশূদ্র। নমঃশূদ্রের কন্যাদের ফরসা হতে নেই- এটাই যেন বিধির বিধান। মোহনাও তাই ফরসা

> নয়, শ্যামলা।... কিন্তু এখনো তার চোখে-মুখে মেঠোপথের শিশিরসিক্ত ঘাসের কোমলতা, তার গায়ের রঙে কচি কলাপাতার সবুজাভা। মোহনা সর্বাঙ্গ শোভনা।" [৮]

তার এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে ওঠে এসেছে গোটা বারাঙ্গনা পল্লীর মেয়েদের শারীরিক গঠন কীরূপ হওয়া প্রয়োজন, তার চিত্রকল্প। মোহনা আসলে এ পল্লির মেয়ে নয়, সনকা তাকে গাঙ্গী থেকে চুরি করে আনে। এভাবে বৃদ্ধ বারাঙ্গনারা মেয়েদের চুরি করে আনে এবং সে পল্লিতে বিক্রি করে দেন। এভাবেই তারা টাকা উপার্জন করে নিজের পেট চালায়। মোহনাকে জানকি নিজের মেয়ের মত লালন-পালন করে বড় করে।

বারাঙ্গনা মেয়েরা যেদিন বারাঙ্গনা হিসেবে নতুন জীবনে পদার্পণ করে তখন নাপিতানিদের দ্বারা তাদের কিছু অনুষ্ঠান হয়। তারপর রাতের বেলা বামুন ঠাকুর এসে বিয়ে দেন। উপন্যাসে মোহনা সেই জীবনে পদার্পণে এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে দেখতে পাই-

> "ডমরনগরের বারাঙ্গনা পল্লির কারো যেদিন এই পেশায় হাতেখড়ি হয়, সেদিন ভোর সকালে নাপিতানি এসে নখ খুঁটে দিয়ে যায়। হাত-পায়ের দশ আঙ্গুলের নখে খুর ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে নাপিতানি বলে,' পুরুষরা যাতে পরেই পায়ের নখে বাঁধা থাকে রামা..." [৯]

মোহনাকেও নাপিতানি এসে তার পায়ের নখ খুঁটে দিয়েছিল। এ মেয়েটিকে ঘিরে আরো নিয়ম নীতি পালন করা হয় বারাঙ্গনাপল্লিতে। রাত্রিবেলা বামুন ঠাকুর এসে গোধূলি লগ্নে বঁটির সঙ্গে তার বিয়ে দেন। এভাবে মোহনা বারাঙ্গনা জীবনে প্রবেশ করা। কিন্তু অন্যান্য বারাঙ্গনা থেকে একটু পৃথক স্থানে বিরাজমান মোহনা। কারণ চণ্ডক মোহনার সতীত্বকে কিনে নিয়ে যায়। ফলে একমাত্র চণ্ডক ছাড়া কেহ মোহনার সাথে মিলন ঘটায়নি।

'মোহনা' র পরিবেশ-প্রতিবেশ 'কসবি' রং মতো অতটা বাণিজ্যিক-এমনটা বলার উপায় নেই। কেননা মিলনের স্থানের বর্ণনা মোহনা বলছে-

> "...ভেতরটা নয়নাভিরাম। একদিকে বিশাল পালঙ্ক, পালঙ্কের পাশে গদিমোড়া হাতওয়ালা চতুষ্কী। চতুষ্কী ঘেঁষে একগুচ্ছ পুষ্প, পুষ্পা ধারে সজ্জিত। ঘরময় অগুরু চন্দনের সুবাস। ঘরের ভেতরের তিন দেয়ালে ছোট ছোট কোটরি... পাত্রটি অসাধারণ সুন্দর হতে হয়।..." [১০]

মোহনা একদিন রাত্রিবেলা চণ্ডকের সাথে তার জীবনের দুঃখ বর্ণনা করতে লাগল। তখন সে বলে গাঙ্গীতে তার বাড়ি। সে আর কখন তার পরিবারের সাথে দেখা করতে পারবে না। এর মধ্য দিয়ে ফোটে বারাঙ্গনা নারীদের জীবনের বাস্তব বেদনা। সমাজে প্রান্তিকায়িত সেই বারাঙ্গানারা তাদের পরিবার পরিজনকে হারিয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করত। যখনই তাদের যৌবন হারিয়ে যায়, তখন আর সমাজে তাদের কোন প্রয়োজন থাকে না।

মোহনার মধ্যে একটা প্রচন্ড মনোভাব বিরাজমান, সে ভাবটা হল কোনো কিছুকে জানার আকাঙ্ক্ষা। তা আমরা দেখতে পাই বাচনি যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তখন মোহনা এক নতুন রূপ ধারণ করে। বাচনের যখন কথা বলতে বলতে থেমে যায়, ঠিক তখনই মোহনা বলে তারপর। আসলে ঔপন্যাসিক মোহনার মধ্যে গোটা বিশ্বের মোহনীয় মোহনার রূপকল্প তৈরি করেছেন।

মোহনার চণ্ডকের প্রতি একটা টান ছিল, সেটা হয়তো বা কিছুটা হলেও মনের টান হতে পারে, তা উপন্যাসে আংশিকভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। চণ্ডক যখনই সে পল্লিতে আসতো, তখন তার মনের মধ্যে একটা স্নেহ

মিশ্রিত অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে। জানকি যখন বলে উঠে, এ কথাটি ঠিক মোহনার আঁচলে বাধা পড়েছে রাজপুত্র চণ্ডক। ঠিক তখন মোহনা কৃত্রিম রং মেশানো কণ্ঠে বলে-

> "মা ...। তুমিও সুর মেলালে মাসির সাথে, তারপর বাতায়ন দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে গভীর কণ্ঠে মোহনা বলল, আজ এত দিন হয়ে গেল, তার দেখা নাই। বাঁধা পড়লে কি কেউ এরকম করে।" [১১]

তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে এক ভালোবাসা মিশ্রিত বক্তব্য। আসলে লেখক এটা দেখাতে চেয়েছেন যে, বারাঙ্গনাদের মধ্যেও একটা ভালোবাসা মিশ্রিত মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। বারাঙ্গনাদের জীবন ও তাদের মনের কথা বার্তা মোহনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ব্যক্ত করেছেন ঔপন্যাসিক। ' কসবি' র মোহিনী থেকে 'মোহনা' র মোহনা চরিত্রে পরিণতির দিক দিয়ে ভিন্ন।

মোহনা চরিত্র দেবযানির মত আকর্ষণীয় চরিত্র। ভীমের পালিত চণ্ডক যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে বৌদ্ধদের পক্ষ নিল, তখন বরেন্দ্রি ছেড়ে সবাই পালালেও মোহনা পালায়নি। প্রতিশোধ স্পৃহায় সে থেকে গেল বরেন্দ্রির সেই বারাঙ্গনাপল্লিতে। শেষ পর্যন্ত ভীম সৈন্য যা করতে পারেনি, তাই করল মোহনা। এখানেই মোহনা চরিত্রের একটি যথার্থ স্বরূপ ফুটে উঠল, যা নিম্নবর্গীয় মানুষদের জন্য সমাজে একান্ত কাম্য।

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসসমূহে নারীর জীবনচিত্র কেবল ব্যক্তিগত বেদনা বা পারিবারিক সংকটের বিবরণ নয়; বরং প্রান্তিক সমাজের নারীদের সংগ্রাম, আত্মমর্যাদাবোধ, শ্রমনিষ্ঠা, মানবিকতা এবং প্রতিবাদী চেতনার এক বাস্তব দলিল। জলপুত্র-এর ভুবনেশ্বরী, দহনকাল-এর চন্দ্রকলা এবং মোহনা উপন্যাসের মোহনা—প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ সামাজিক অবস্থান থেকে প্রতিকূল বাস্তবতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকার এক অনন্য উদাহরণ। তাঁদের জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, নিম্নবর্গীয় নারীরা কেবল সংসারের ভার বহনকারী নন; তাঁরা পরিবার, সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের অন্যতম শক্তি।

এই চরিত্রগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে মাতৃত্ব, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসা, তেমনি রয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীন সত্তার প্রকাশ। বিশেষত ভুবনেশ্বরীর আত্মনির্ভরতা, চন্দ্রকলার সংগ্রামী মানসিকতা এবং মোহনার মানবিক অনুভূতি ও প্রতিরোধচেতনা নারীর বহুমাত্রিক পরিচয়কে উন্মোচিত করে। এর মাধ্যমে হরিশংকর জলদাস প্রমাণ করেছেন যে, সমাজের প্রান্তিক নারীদের জীবনও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পারে এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সমাজবাস্তবতার গভীরতম রূপ অনুধাবন করা সম্ভব।

অতএব, বলা যায় যে, হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে নারী কেবল সহানুভূতির পাত্র নন; তাঁরা সংগ্রামী, কর্মঠ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং পরিবর্তনের ধারক। তাঁর নারীচরিত্রসমূহ বাংলা কথাসাহিত্যে প্রান্তিক নারীর জীবনসংগ্রাম ও মানবিক অস্তিত্বকে নতুন তাৎপর্য প্রদান করেছে। ফলে তাঁর রচনায় নারী বিষয়ক আলোচনা কেবল সাহিত্যিক মূল্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজতাত্ত্বিক, মানবিক এবং নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য তপোধীর, 'বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০।পৃ-৫১
২.জলদাস হরিশংকর, 'জলপুত্র' মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮।পৃ-২৭

৩.তদেব্,পৃ-২৯
৪.তদেব্,পৃ-৭৭
৫.জলদাস হরিশংকর, 'দহনকাল', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ - ২০১০। পৃ-১৩-১৪
৬.তদেব্,পৃ-৬১
৭.তদেব্,পৃ-৭৬
৮.জলদাস হরিশংকর' 'মোহনা', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ - ২০১৩।পৃ-২৬-২৭
৯.তদেব্,পৃ-২৩
১০.তদেব,পৃ-৪৯
১১.তদেব,পৃ-৭৫

Bibliography:

- জলদাস হরিশংকর, 'জলপুত্র' মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮।
- জলদাস হরিশংকর, 'দহনকাল', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ - ২০১০।
- জলদাস হরিশংকর' 'মোহনা', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ - ২০১৩।
- ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ’ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০।

CC BY NC